স্বাস্থ্যব্যবস্থার চিকিৎসা জরুরি

প্রভাষ আমিন

সদ্যপ্রয়াত ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী লন্ডনে গিয়েছিলেন এফআরসিপি ডিগ্রি নিতে। চার বছরের পড়াশোনা শেষে এক সপ্তাহ পর যখন ফাইনাল পরীক্ষা, তখনই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ডা. জাফরুল্লাহর কাছে ডিগ্রির চেয়ে দেশ বড় হয়ে যায়। পড়াশোনা ফেলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি পাকিস্তানের পাসপোর্ট ছিড়ে ফেলে ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে ভারতে আসেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে। সেখানে দায়িত্ব নেন বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালের। বিজয়ের পর সেই ফিল্ড হাসপাতালই পরবর্তীতে হয় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। ডা. জাফরুল্লাহ চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সব মানুষের জন্য চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে। তিনি আমৃত্যু সেই চেষ্টাটা করে গেছেন। সারাদেশে না পারলেও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে গরীব মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। তিনি নিজে কখনো চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাননি, এমনকি নিজের হাসপাতালের বাইরেও চিকিৎসা নেননি। তার নীতি ছিল স্বাধীন দেশে নিজের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের ওপর যদি তিনি নিজেই আস্থা রাখতে না পারেন, তাহলে সাধারণ মানুষ আস্থা রাখবেন কেন।

ডা. জাফরুল্লাহর মতো আরেক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক কাজী কামরুজ্জামানও গরীব মানুষের চিকিৎসা সেবার জন্য গড়ে তুলেছেন কমিউনিটি হাসপাতাল। কিন্তু একটি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বা একটি কমিউনিটি হাসপাতাল ১৭ কোটি মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশকে হৃদয়ে ধারণ করে জাফরুল্লাহ বা কামরুজ্জামান চেষ্টা করলেও তা যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে এখন চলছে চিকিৎসা সেবা নয়, বাণিজ্য।

মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় একবার তার হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে। সবাই তাকে পরামর্শ দেয় পার্শ্ববর্তী সিঙ্গাপুরে গিয়ে চিকিৎসা করাতে। তিনি রাজি হননি। তিনি মালয়েশিয়ার চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নত করে দেশেই চিকিৎসা নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ঘোষণা করেছিলেন তাকে যেন কখনোই চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়া না হয়। বাংলাদেশের ডাক্তাররা সাহস করেননি বলে তিনি পুরোপুরি নিজের অবস্থানে থাকতে পারেননি। তবে সাধারণ চিকিৎসা তিনি সাধারণ মানুষের মতো টিকেট কেটে সরকারি হাসপাতালেই নেন। চিকিৎসা নিতে বিদেশে না যাওয়ার ব্যাপারে শেখ হাসিনার নীতিগত সিদ্ধান্তের সাথে আমি একমত।

কিন্তু বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থাকে আমরা এখনও সেই মানে তুলতে পারিনি, যাতে করে সাধারণ মানুষ পুরোপুরি আস্থা পায়। জাফরুল্লাহ চৌধুরী গোঁয়ারের মতো বিদেশে না যাওয়ার ব্যাপারে অনড় না থাকলে হয়তো আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারতেন।

দেশের মানুষের পুরোপুরি আস্থা অর্জন করার মতো অবস্থায় যেতে না পারলেও বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থাকে আমি বিস্ময়কর মানি। ডাক্তারদের মনে হয় জাদুকর। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে যেভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়, বিশ্বের আর কোনো দেশে এটা সম্ভব কি না আমি জানি না। কোয়ানটিটি অনেক বেশি বলে কোয়ালিটি হয়তো পুরোপুরি রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালে রোগী ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। যখন যে অবস্থায়ই যান, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আপনি প্রাথমিক চিকিৎসা পাবেনই।

হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের সিসিইউ'র সাথে কারওয়ান বাজারের কোনো পার্থক্য নেই। নিচে, ওপরে, সিঁড়িতে, বাথরুমের সামনে রোগী। ডাক্তারদের রোগীর কাছে যেতে হয় আরেক রোগীর গায়ের ওপর দিয়ে। এ ব্যাপারে হাসপাতালটির সাবেক এক পরিচালকের সাথে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, আসন সংখ্যার অতিরিক্ত রোগী ফিরিয়ে দিলে আমরাও হাসপাতালটিকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারতাম। কিন্তু তাতে প্রতিদিন আমাদের হাসপাতালের সামনে রোগী মারা যেতো। আমরা কোনো রোগী ফিরিয়ে দেই না। হৃদরোগ ইনস্টিটিউট কোনো রোগী ফিরিয়ে দেয় না বলেই সেখানে বাজারের মতো অবস্থা হয়। কিন্তু বিনা চিকিৎসায় কেউ মারা যায় না।

এতকিছুর পরও বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা নেই। প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক মানুষ চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যায়, তাতে খরচ হয় মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। বাংলাদেশের অনেকে আছেন, জ্বর হলেও সিঙ্গাপুর চলে যান। তাদের কথা আলাদা। কিন্তু মধ্যবিত্তদের অনেকে স্রেফ আস্থার সঙ্কটের কারণে অন্তত ভারতে হলেও যান। অথচ সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে দেশে চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে অনেকটাই। হৃদরোগ, এমনকি ক্যান্সারের মতো অসুখেরও উন্নত চিকিৎসা দেশেই সম্ভব। সমস্যা ব্যবস্থাপনা আর আস্থায়। সরকারি খাতে মূল সমস্যা ব্যবস্থাপনা, আর বেসরকারি খাতে আস্থা ও বিশ্বাসের ঘাটতি। বেসরকারি খাতে আরেকটা বড় সমস্যা হলো, বাণিজ্যিকীকরণ।

বাংলাদেশে যেহেতু স্বাস্থ্য বীমার ধারণাটি জনপ্রিয় নয়; তাই মোটামুটি একটা অসুখ, একটা পরিবারকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। রোগী সুস্থ হতে হতে পুরো পরিবার অসুস্থ হয়ে যায়। জমিজমা বিক্রি করে, জমানো টাকা খরচ করে চিকিৎসা করতে গিয়ে অনেক পরিবার ফতুর হয়ে যায়। দেশের বাইরে, সেটা ভারত হোক বা ব্যাংকক, নিশ্চয়ই অনেক বেশি টাকা খরচ হয়। তারপরও মানুষ কেন যায়? যায় কারণ সেখানে গেলে হয়রানিমুক্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিস পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এই ওয়ান স্টপ সার্ভিস ভাবনাটারই বড় অভাব। গ্রাম থেকে কোনো রোগী ঢাকায় এলে এই ডাক্তার সেই ডাক্তার, এই টেস্ট সেই টেস্ট, এই হাসপাতাল সেই হাসপাতাল ঘুরতে ঘুরতে তার বারোটা বেজে যায়। তারা মনে করে, কোনো রকমে ট্রেনে বা বাসে করে নিদেনপক্ষে কলকাতা যেতে পারলেও অনেক ভালো চিকিৎসা পাওয়া যাবে। কলকাতার সাথে ঢাকার চিকিৎসার কোনোই পার্থক্য নেই। বাংলাদেশের অনেক ডাক্তার আছেন, যারা বিশ্বসেরা। কিন্তু ঐ যে হয়রানির ভয়েই তারা দেশের বাইরে চলে যায়।

বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবা নেটওয়ার্ক কিন্তু এখন বিস্তৃত। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। কিন্তু এখনও ১৭ কোটি মানুষের চাপ সামলানোর মতো যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি সেই নেটওয়ার্ক। কোয়ানটিটি আমরা অর্জন করেছি, এখন যাত্রা করতে হবে কোয়ালিটির পথে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা হয়রানিমুক্ত করতে হবে। বিশেষায়িত ওয়ানস্টপ সার্ভিস নিশ্চিত করতে হবে। ঢাকার বাইরে থেকে কোনো রোগী এলে যেন তিনি সহজেই জানতে পারেন, তাকে ঠিক কোথায় যেতে হবে। কোথায় গেলে তিনি সঠিক ডাক্তার পাবেন, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাবেন। আর বেসরকারি হাসপাতাল মালিকদের মাথা থেকে বাণিজ্যের ভাবনাটা দূর করতে হবে। তারা অবশ্যই ব্যবসা করবেন, লাভ করবেন। কিন্তু ব্যবসার নামে যেন বিপদগ্রস্থ মানুষের পকেট না কাটেন। লাভের জায়গা যেন লোভ দখল না করে।

আমরা যদি দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে বহুবিধ লাভ। প্রথম কথা হলো দেশপ্রেমের ব্যাপার তো থাকলোই। দেশপ্রেম যদি আপনি আলাদা করে রাখেন, নগদ লাভও আছে। বাঁচবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। বৈদেশিক মুদ্রার কথাও না হয় সাধারণ মানুষ বুঝবে না। চিকিৎসাব্যবস্থা ঠিক করতে পারলে সাধারণ মানুষের পকেটের ওপর চাপও কমবে। ধরুন ভারতের দামেও যদি বাংলাদেশে সমান মানের চিকিৎসা দেওয়া যায়; তাহলেও বিমান ভাড়া, হোটেল খরচের টাকাটা বেঁচে যাবে। খালি মানটা ঠিক করতে হবে। আমাদের সামর্থ্য বেড়েছে, সক্ষমতাও বেড়েছে। তার সাথে শুধু দক্ষতা, আন্তরিকতা, মানবিকতা যোগ করতে হবে। কিন্তু মান ঠিক করতে না পারলে খালি দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে অসুস্থ মানুষকে দেশে আটকে রাখা যাবে না।